দৈনিক খবর

তারিখ ... 16 FEB 1993 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

পরীক্ষায় অসদুপায় এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে

● অধ্যাপক অরুণোদয় দেব কানুন ●

আজকাল পত্রিকার পাতা খুললেই যে খবরগুলো আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার অধিকাংশই সন্ত্রাসসম্বলিত এবং পত্রিকার বিবরণ থেকেই বোঝা যায়, এই সমস্ত সন্ত্রাসীরা কখনও ছাত্র ছিল বা এখনও শিক্ষাগত কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত। সুতরাং যেমন বলা হয়ে থাকে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"– এই নীতিবাক্যটি যদি সত্য বলে গ্রহণ করে নেয়া যায় তাহলে স্বাধীনতার একুশ বছর পর প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, অনেক ত্যাগের বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা ছিনিয়ে এনেছিলাম তা কতটুকু রক্ষা করতে পারছি। এমতাবস্থায়, কেউ যদি আমাদের স্বাধীন জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে বা কটাক্ষ করে তবে কি তা খুব একটা অমূলক হবে? সুতরাং স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে হলে আমাদের এই ব্যর্থতা ও গ্লানির মূলোৎপাটন আশু প্রয়োজন নয় কি? আমাদের এই ব্যর্থতা কি প্রমাণ করে না যে, দেশ গড়ার নাম করে একটা বিরাট প্রভাবশালী মহল সমানে Sabotage বা অন্তর্ঘাত চালিয়ে যাচ্ছে? বলাবাহুল্য, এই প্রভাবশালী মহলই যে সাকুল্য মূল্যবোধের অবক্ষয়, যুব–কিশোরদের নৈতিক অধঃপতন এবং পরিণামে খুন, রাহাজানি ও সন্ত্রাস ইত্যাদি সব বিষয়ে নাটের গুরু তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। দেশাত্মবোধে উদ্দীপ্ত প্রতিটি নাগরিকের কর্তব্য এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো। আমাদের দেশের প্রায় আশিভাগ লোকই অজ্ঞ, অশিক্ষিত। তাই উল্লেখিত জাতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ–প্রতিরোধকল্পে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং ঐ বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আসলে কি ঘটছে বা কিভাবে তারা চরিত হচ্ছেন, সে বিষয়ে সচেতন করে উক্ত আন্দোলনে শরীক হওয়ার সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যথায় শিক্ষাঙ্গন তো বটেই, সারাদেশই সন্ত্রাসের লীলাভূমিতে পরিণত হয়েই থাকবে এবং এই অবস্থা থেকে উত্তরণ হবে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

অন্যদিকে ইদানীং ছাত্র সমাজে বিভিন্ন অজুহাতে পরীক্ষা বর্জন, অসদুপায় ইত্যাদি যে সব আত্মধ্বংসী প্রবণতা গড়ে উঠেছে তার পরিণাম যে কত খারাপ এবং সুদূরপ্রসারী হতে পারে তা অবশ্যই অনুধাবনের দাবী রাখে। কিন্তু তার পেছনে কারণ কি? কারণ নিশ্চয়ই আছে এবং তা তেমন রহস্যাবৃতও নয়। প্রথমতঃ শিক্ষা পদ্ধতি ও পরীক্ষাসম্বলিত নিয়মাবলীর মধ্যে অসামঞ্জস্য; যার ফলে অধিকাংশ ছাত্র–ছাত্রী শিক্ষালব্ধ জ্ঞান বা শক্তি–সামর্থ্য নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভয় পায়। নতুবা পরীক্ষা তো শিক্ষারই বিচার বিভাগীয় এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান বই কিছু নয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে জ্ঞানানুশীলনই যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য, জ্ঞানানুশীলনে তেমনি পরীক্ষা অপরিহার্য, উপযোগী এবং গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ পরীক্ষা ছাড়া কোনো শিক্ষা, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, অসার বস্তু মাত্র। তাই ছাত্রদের পরীক্ষাভীতি এবং অসদুপায় অবলম্বনের মতো হীনমন্যতা দূরীভূত করতে হলে তাদের সেই অনুসারে শিক্ষা প্রশিক্ষণ দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। গ্রামীণ একটা প্রবাদ আছে, 'অভাবে স্বভাব নষ্ট।' স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা যখন পরীক্ষার চাহিদামাফিক নিজকে তৈরী করে নিতে পারে না তখনই তাদের মনে উপরোক্ত বিরূপ বিকৃত মানসিকতার সৃষ্টি হয়। মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এটাই প্রতীয়মান হবে যে, আমাদের ছাত্ররা দারুণ দৈন্যক্লিষ্ট। আর সে দৈন্য শিক্ষাগত। পক্ষান্তরে পরীক্ষা হচ্ছে কারও অর্জিত জ্ঞানের প্রতি একটা চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করবার মতো যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকার কারণে আজকের অধিকাংশ ছাত্ররা পরীক্ষাতে বিতৃষ্ণ। অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে অবস্থার চাপে পড়ে অনন্যোপায় ছাত্ররা পরীক্ষায় বসলেও জানাতাবের তাড়নায় হতাশ ও উদভ্রান্তের মতো বেপরোয়াভাবে অসদুপায় অবলম্বনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সঙ্গতকারণেই এটাকে একটা মানসিক বিকৃতি বা ব্যাধি বলা চলে। অপ্রিয় হলেও প্রশ্ন রাখতে হচ্ছে, সংশ্লিষ্ট দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ কি কখনও এ ব্যাপারে ভাবেন? তাই এ ক্ষেত্রে ছাত্ররাই কি পুরোপুরি কিংবা এককভাবে দায়ী না অন্যরা যারা সবচেয়ে বেশী সচেতন থাকার কথা তারা দায়ী? বিবেচনা বাঞ্ছনীয়। একটু তলি খলে দেখা যাবে এই ব্যাধির জন্য দায়ী, অব্যবহিত পূর্বসূত্র সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ এবং তৎপ্রণীত গোটাশিক্ষাব্যবস্থা।

দ্বিতীয়তঃ ছাত্ররা তো গোটা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কোনো সম্প্রদায় নয়। কাজেই সমাজে যা কিছু ঘটছে তার কম–বেশী এদের ওপর প্রভাব বিস্তার করবেই। এতে অবাক হবারও কিছু নেই। সমাজে দুর্নীতিকে যেভাবে একমাত্র নীতিতে পরিণত করা হয়েছে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ত্বরিতগতিতে ব্যাপকভাবে চালু করার প্রয়াস নেয়া হচ্ছে তা থেকে ছাত্র সমাজ যদি তফাৎ থাকতে পারে তাহলে সেটাই হবে অত্যাশ্চর্য ব্যাপার। আমাদের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা যেখানে ঘুষ ও দুর্নীতিকে পেশাগত আয়ের প্রধান উৎস হিসাবে গণ্য করছেন সেখানে ছেলে–মেয়ে, ভাই–ভাতিজারা (বিশেষ করে এরাই তো স্কুল–কলেজের ছাত্র) ন্যায়–নীতি, পরিণতি ইত্যাদির দিকে দৃকপাত, কর্ণপাত করবে কেন? এমতাবস্থায়, নকল প্রবণতাকে রুখতে হলে প্রথমেই এর উৎপাদকগুলোকে চিহ্নিত করে তার মূলে আঘাত হানতে হবে।

যাক, সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার–বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পরীক্ষায় নকল কোনো আলাদা ব্যাপার নয়। সমাজে দুর্নীতির যে মহীরুহ সৃষ্টি হয়েছে এটা তারই অংশবিশেষ বা প্রতিফলন। মনোস্তাত্ত্বিকেরা নিশ্চয়ই এ বিষয়ে একমত হবেন যে, অনুকরণ প্রবণতা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। তাই বড়রা যা করবেন ছোটরা সেগুলো কম–বেশী আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে নেবে। আমাদের সমাজে নকলের এমন ছড়াছড়ি যে, এখন আসল বলতে যেন ঐ নকলকেই বুঝায়। খাদ্যদ্রব্য থেকে শুরু করে জীবন রক্ষাকারী ওষুধপত্র পর্যন্ত নকল–ভেজালে ভরপুর। যুব–কিশোররা আমাদের দর্পণস্বরূপ। এদের মধ্যে আমরা আমাদের প্রতিচ্ছবি প্রতিবিম্ব দেখতে পাই। তাই জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয়, সমাজে যেভাবে ঘুষ ও দুর্নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে এবং নির্বাচনে দলীয় স্বার্থের খাতিরে নকল ভোট নিক্ষেপের যে নির্লজ্জ মানসিকতা গড়ে উঠেছে, পরীক্ষায় নকল প্রবণতা তার প্রতি মৌন এবং পরোক্ষ প্রতিবাদ বললে নিতান্ত অযৌক্তিক হবে না তো? বিশ্ব বিখ্যাত রুশ লেখক লিও টলস্টয় যে কথাটি বলেছেন, মনে হয় আমাদের ছেলেমেয়েরা বাস্তবে তা দেখিয়ে দিচ্ছে। টলস্টয়ের লেখনী নিঃসৃত বাক্যটি হচ্ছে, 'Children may be wiser than their elders'. সুতরাং নির্দ্বিধায় বলা চলে, পরীক্ষায় নকল করে ছাত্র–ছাত্রীরা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আমরা কত পচে গেছি।

তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক অঙ্গনে ছাত্রদের টেনে নিয়ে হাতিয়ার হিসেবে অকাজে–কুকাজে ব্যবহারও অনেকাংশে ছাত্রদের চারিত্রিক অধঃপতন ঘটিয়ে হীনমন্য করে তুলেছে। তাছাড়া ছাত্ররা সত্যিকার অর্থে রাজনীতি করছে না। পক্ষান্তরে বলা যায়, এরা নোংরা রাজনীতির শিকারে পরিণত হয়েছে। অথবা বলা চলে নোংরা রাজনীতির আবর্জনায় এরা নিমজ্জিত হয়েছে। তবে দেশে খাঁটি রাজনীতি চালু থাকলে এতে ছাত্রদের অংশীদারিত্বে অপকারের পরিবর্তে উপকারই যে হবে তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। নিকট অতীত অর্থাৎ বায়ান্ন থেকে একাত্তরের বাংলাদেশের ইতিহাস এ সত্যের যথেষ্ট সাক্ষ্য গ্রহণ করে। রাজনীতিতে জনগণের সাথে নেতৃবৃন্দের সুসম্পর্ক গড়ে তোলাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক। এতে সরলমনা ছাত্রদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি না খেলাই ভাল। এর মানে এই নয় যে, আমরা বলতে চাচ্ছি না ছাত্ররা আদৌ রাজনীতি করবে না। আমরা চাই লেখাপড়া, পরীক্ষা যা একজন ছাত্রের পক্ষে সর্বাবস্থায় অপরিহার্য তা বজায় রেখে অন্য যা কিছু ভাল মনে করে করুক। কিন্তু এরা নিজেরাই যদি নীতি না মানে তাহলে রাজনীতি করে জাতিকে নেতৃত্ব দিবে কিভাবে? আর জাতিকে নেতৃত্ব দিতে গেলেও তো যথেষ্ট রাজনৈতিক প্রজ্ঞা প্রয়োজন। এই প্রজ্ঞার্জনে ও বিদ্যাশিক্ষা বা জ্ঞানানুশীলনের ভূমিকা প্রশ্নাতীত এবং গুরুত্বপূর্ণ। বলতে দ্বিধা নেই, আমাদের দেশে সার্থক, আদর্শ বা সুষ্ঠ রাজনীতি বলতে যা বুঝায় তা নেই বললেই চলে। অধিকন্তু ভবিষ্যতেও এই দৈন্য দূরীকরণের নেতৃত্ব আসবে আজকের যুব, কিশোর এই ছাত্র সমাজ থেকেই। সুতরাং এদের কলুষমুক্ত রেখে জ্ঞানাহরণের সুযোগ দিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল রাখার পথ অবাধ ও নিশ্চিতকরণ বাঞ্ছনীয়। সমাজের উচ্চ, উচ্চতর, উচ্চতম স্থানে যারা অধিষ্ঠিত আছেন তারা যা করবেন নিম্ন, নিম্নতর, নিম্নতম স্থানের অধিকারীরা তা অনুকরণ করবেই। বলাবাহুল্য, আমাদের সমাজদেহের মাথা থেকে পচন শুরু হয়ে ক্রমে তা সারাদেহে বিস্তৃতি লাভ করছে। তাই এর চিকিৎসা করতে হলেও ঐ উৎপত্তিস্থলে আগে ওষুধ লাগাতে হবে। নতুবা নকল এবং সন্ত্রাস কোনোটাই বন্ধ করা যাবে না। কারণ এ দু'টোর উৎস একটাই– নৈতিক অবক্ষয়। দু'টোতেই নৈতিকতাবোধের প্রশ্ন জড়িত। তাই দৃষ্টান্তের মাধ্যমে এদের সামনে সেই রকম আদর্শ তুলে ধরতে পারলে সহজেই এই প্রবণতা কমে আসবে। কথায় আছে, 'Example is better than precept'.

আমাদের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দতা অনেক কিছু নিয়েই কাদা ছোঁড়াছুড়ি করে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে প্রয়াসী। কিন্তু ছাত্ররা যে নকল করে দেশ, জাতি ও সমাজের সর্বনাশ ডেকে আনছে, সেই ব্যাপারে কেউ তো মুখ খুলছেন না। তারা নীরবতা পালন করছেন, পাছে তাদের সস্তা জনপ্রিয়তায় ধস নামে। কিন্তু নকল প্রবণতা বন্ধ করতে হলে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে দল–মত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেহেতু এটা কোনো রাজনৈতিক ইস্যু নয়, এটা নিছক সামাজিক দায়িত্ব।

নকলের ব্যাপারে এবং ছাত্রদের বিপথগামিতার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের ভূমিকা, দায়িত্ব ও কর্তব্য নিয়ে প্রায়ই প্রশ্ন তোলা হয়। বিরূপ সমালোচনা করা হয়। তাই বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি, পরীক্ষা কেন্দ্রের পরিস্থিতি এবং একজন তদ্র নিরীহ শিক্ষকের অসহায় অবস্থা নিয়ে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এত প্রতিকূল অবস্থায় এখনও শিক্ষকরা যতটুকু কর্তব্যনিষ্ঠ রয়েছেন অন্য ক্ষেত্রে তা বিরল। অবশ্য কিছু কিছু শিক্ষক চরিত্রহীনতার পরিচয় দিচ্ছেন। কিন্তু দুর্নীতি মহীরুহের ছায়াতলে সবার পক্ষে অটল থাকা তো সম্ভব নাও হতে পারে। তাছাড়া 'পরিস্থিতির শিকার' বলেও তো একটা কথা আছে।

মোট কথা দেশের আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির সার্বিক উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত ছাত্রদের এর কুফল থেকে রক্ষা করা যাবে না। এবং বাংলাদেশে আইন–শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতির জন্যে নোংরা রাজনীতিই যে দায়ী এটা সুধীমাত্রেই স্বীকার করতে দ্বিধাবোধ করবেন না। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে পড়ে গেল। আজকাল পল্লী সমাজে রাজনীতি শব্দটি কদর্থে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কোনো ব্যক্তি কারও কাছে প্রতারিত হলে ধমক দিয়ে বলে 'আমার সাথে রাজনীতি করছ নাকি?' বলাবাহুল্য, রাজনীতি সম্পর্কে দেশের শতকরা আশিভাগ মানুষের এই একই ধারণা। রাজনীতির প্রতি গণমানুষের এই মনোভাব ও বক্রোক্তি থেকে এটাই কি প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের দেশের রাজনীতিতে এক জঘন্য পরিবেশ সাধারণ মানুষকে ধোঁকাবাজির শিকারে পরিণত করেছে? সুতরাং বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের খাতিরে এহেন রাজনীতি থেকে ছাত্র সমাজকে তফাৎ রাখা অবশ্যই মঙ্গলকর।

যাই হোক, অধুনা ছাত্রদের মনে যে পরীক্ষাভীতির সঞ্চার হয়েছে এবং অসদুপায় অবলম্বনের প্রতি যে প্রবণতা দেখা দিয়েছে তা একটি জাতীয় সমস্যা হিসেবে গণ্য করে এর আশু সমাধানও জাতীর পর্যায়ে চিন্তনীয় বিষয়। অন্যথায় এ জাতি যে অচিরেই চরম অবনতির অতল তলে তলিয়ে যাবে তা বলাই বাহুল্য। ভুলে গেলে চলবে না, যুব–কিশোরই তো একটা জাতির জনশক্তির মূল উৎস। আর সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে উক্ত শক্তিকে উপযোগী করে সদ্ব্যবহার করার প্রযুক্তি।

পরিশেষে এ কথাই বলতে হয়, ছাত্রদের বিপথগামিতার পেছনে উপরোক্ত যেসব কারণ রয়েছে তা দূরীকরণের মধ্যদিয়ে আমাদের জাতীয় উন্নয়ন, অগ্রগতি সূচিত হতে হবে। অন্যথায় যৌকস পরিকল্পনা হবে বাস্তবায়নের পরিপন্থী। কারণ, যে কোনো সমস্যাই সমাধান করা যায় যদি সমস্যার উৎস নিয়ে চিন্তা করা হয় এবং সমাধানের সদিচ্ছা থাকে। যার যে ভুল–ত্রুটি রয়েছে তা সংশোধন করে সঠিক পদক্ষেপ নিলে নকল প্রবণতা এবং সন্ত্রাস– দু'টোই নিয়ন্ত্রণে আনা দুরূহ কাজ নয়। সুতরাং আমাদের বোধোদয়ই আমাদের ভাগ্যোন্নয়নের একমাত্র পথ।